কলকাতার উপকণ্ঠে হুগলী জেলার হিন্দমোটরের প্রথিতযশা লোকপ্রিয় ডাক্তার স্বর্গীয় অজিতরঞ্জন গুহ-র জ্যেষ্ঠপুত্র সব্যসাচী-র জন্ম কলকাতায়, ১৯৫৩ সালের ১লা মে। তাঁর মাতা ছিলেন ধর্মপ্রাণা ভক্তিমতি ঁসুলেখা দেবী।

ষষ্ঠ-সপ্তম শ্রেণীতে পাঠরত অবস্থায় সব্যসাচী-র পড়াশুনায় অমনোযোগ, ঘনঘন স্কুল পালানোয় উদ্বিগ্ন মাতা পুত্রের মঙ্গল কামনায় পড়াশুনার সাথে সাথে ধর্মীয় এবং আধ্যাত্ম জীবনের নিগড়ে পুত্রকে গড়ে তুলতে তাকে তাঁর গুরুদেবের পলাশীর আশ্রমে স্থানান্তরিত করেন এবং আশ্রমের স্কুলে আশ্রমিক ব্রহ্মচর্য্য পালন ও বিদ্যালাভের ব্যবস্থা করেন। একঘেয়ে আশ্রম জীবনের গতানুগতিকতার হাত থেকে মুক্তি পেতে সব্যসাচী স্কুলের ছেলেদের নিয়ে ফুটবল খেলা শুরু করেন ও অল্প দিনেই নিজের দক্ষতায় ভাল খেলোয়াড় হিসেবে পরিচিত হন। এছাড়া এ সময় তিনি নিয়মিত যোগাসন মুদ্রা ও প্রাণায়ামের মাধ্যমে হঠযোগে যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করেন। মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী পিতা রাজনৈতিক কারণে কারান্তরালে গেলে দুই বৎসর আশ্রমবাসের পর সব্যসাচী ফিরে আসেন হিন্দমোটরে। এর কিছুদিন পরেই পিতার কারামুক্তি ঘটে এবং তিনি স্ব-পেশায় স্থিত হন। ফুটবল খেলায় সব্যসাচীর দক্ষতা এখানেও তাঁকে জনপ্রিয় করে তোলে আর ভবিষ্যতে বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় হবার বাসনা তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে। প্রতিপক্ষের সমর্থকদের হাতে নির্যাতিত হবার ভয়ে প্রতিপক্ষকে ৫/৬-টি গোলের মালা পরিয়ে খেলা শেষ হবার আগেই সব্যসাচীকে মাঠ ত্যাগ করে নিরাপদ আশ্রয়ে পালাতে হোত। এহেন প্রত্যুৎপন্নমতি প্রতিভাবান খেলোয়াড় যখন পিতার দেওয়া বিবেকানন্দ এবং আইনষ্টাইন-এর বইয়ের মধ্যে আইনষ্টাইনের বইটি বেছে নিয়ে খেলার মাঠ ত্যাগ করে গৃহকোণে গভীর নিষ্ঠা, মনোযোগ ও অধ্যাবসায়ের সঙ্গে অধ্যয়নে মগ্ন হলেন তখন তাঁর সহপাঠীরা অবশ্যই অবাক হয়েছিলেন - সন্দেহ নেই।

স্ব-উদ্যোগে স্বল্পকালেই তিনি পাঠ্যক্রম বহির্ভূত 'ক্যালকুলাস' শিখে নেন এবং স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় অত্যন্ত ভাল ফল করে, পিতা-মাতা, আত্মীয়-পরিজনের মুখে হাসি ফুটিয়ে, কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রি ইউনিভার্সিটি-তে ভর্ত্তি হন।

ভারতের বুকে হুনানের বীজ নকশালবাড়িতে সে সময় গর্জে ওঠে বসন্তের বজ্র নির্ঘোষ। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে মেধাবী প্রতিভাবান ছাত্র সব্যসাচী ''মেহনতী মানুষের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লড়াই''-এ সামিল হয়ে ''গ্রাম দিয়ে শহর ঘের'' স্লোগান-কে বাস্তবায়িত করতে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরতে থাকেন। অনাহার, অর্ধাহার, আশ্রয়হীন মৃত্যুর মুখোমুখি এক জীবনস্রোতে ভেসে যায় তাঁর যৌবনের অনেকগুলি দিন।

বিপ্লব ব্যর্থ হয়। সাম্যবাদের স্বপ্ন ভেঙ্গে যায় - হতাশ, ক্লান্ত, উদ্‌ভ্রান্ত সব্যসাচী ধর্মপ্রাণা মাতার গুরুদেবের বারাণসীস্থিত আশ্রমে আত্মগোপন করেন।

এক গভীর রাতে একাকী গঙ্গার ঘাটে বসে থাকাকালীন জলে ভেসে আসা তাঁরই সমবয়সী এক যুবকের মৃতদেহ দেখে বিপ্লব চলাকালীন বারবার মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে আসা সব্যসাচীর অন্তরমধ্যে ধ্বনিত হয় উপনিষদের বাণী ''ত্বমেব বিদিত্বাহেতি মৃত্যুমেতি নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়''। আত্ম-জিজ্ঞাসার এই প্রথম স্ফুরণ তাঁর মনের মধ্যে জ্বালিয়ে দেয় মুক্তির তীব্র পিপাসা। বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরীতে চলল পঠন পাঠন - ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক বইয়ের মধ্যে উত্তর খোঁজা, ''কি ভাবে তাঁকে বিদিত হওয়া যাবে? মুক্তির কি সেই পথ, পন্থা-প্রকরণ?''

বিপ্লব পরবর্তীকালে রাজনৈতিক অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে এলে সব্যসাচী কলকাতায় ফিরে আসেন ও পদার্থবিদ্যায় স্নাতক হয়ে ওড়িশার সম্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুর্দান্ত রেজাল্ট করে প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে স্নাতোকোত্তর পাঠ শেষ করেন। এরপর তিনি ব্যাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ্ সায়েন্স (IISc) থেকে Ph.D. করেন। স্নাতকোত্তর পাঠের সময় রৌরকেল্লায় থাকাকালীন দক্ষিণী ব্রাহ্মণ কণ্যা ডঃ ভামিডিপাটি লক্ষ্মী রাওয়ের সঙ্গে সব্যসাচীর যে প্রণয় পর্ব শুরু হয়েছিল ইতিমধ্যে তা অনাড়ম্বরে শুভ পরিণয়ে পরিণতি লাভ করেছে। শ্রীমতী লক্ষ্মী রাও ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ্ টেকনোলজি, বম্বে (IIT, Bombay) থেকে Ph.D.করে ব্যাঙ্গালোরে সেন্ট যোসেফ কলেজ (St. Joseph College)-এ অধ্যাপনার কাজ করেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট

অফ্ সায়েন্স (IISc)-এ গবেষণার কাজে যোগদান করেন। ওই সময়েই সব্যসাচী ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন-এ (ISRO) কর্মরত ছিলেন একজন বৈজ্ঞানিক হিসাবে। দু'বছরের মধ্যেই ডঃ লক্ষ্মী গুহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ-জার্সি স্থিত রাটগার্স বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর গবেষণা-র কাজে চলে আসেন এবং কয়েক মাসের ব্যাবধানে সব্যসাচীও ওই একই বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা-র কাজে যুক্ত হন। পরবর্তী বছরগুলিতে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িক পত্রিকাগুলিতে সব্যসাচী ও তাঁর গবেষক দলের পদার্থবিদ্যার উপর গবেষণার কাজ এবং বিষয়বস্তু প্রকাশিত হতে থাকে।

শুরু হয় সব্যসাচীর জীবনের গবেষণার আর এক অধ্যায় -

অশেষ প্রাণশক্তিতে ভরপুর সব্যসাচী জীবনের এই প্রচন্ড কর্ম-কোলাহলের মধ্যেও জীবন জিজ্ঞাসার উত্তর খোঁজা থেকে বিরত হন নি। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ - বিবেকানন্দের প্রভাব এবং পরবর্ত্তীকালে জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির প্রভাব তাঁর মধ্যে আত্মজ্ঞান লাভের তীব্র আকাঙ্খার বাতিটি জ্বালিয়ে রেখেছিল। অবশেষে তিনি যখন উপলব্ধি করলেন যে শুধু পুস্তক পাঠের মাধ্যমে আত্ম-জিজ্ঞাসার উত্তর পাওয়া যাবে না, আধ্যাত্মিক অনুশীলনও প্রয়োজন, তখন তিনি ''রামচন্দ্র মিশন'' নামে সহজ রাজযোগ অনুশীলনের এক সংস্থায় দীক্ষা নেন ও নিয়মিত প্রার্থনা ও ধ্যান অনুশীলন করতে থাকেন। জীবনের রহস্য উন্মোচনের তীব্র আকাঙ্খা তাঁকে ঐকান্তিক নিষ্ঠাবান এবং কঠোর অধ্যাবসায়ী সাধকে পরিণত করে। পরবর্তী কয়েক বৎসরে তিনি ধ্যানে শাস্ত্রে বর্ণিত সমস্ত অভিজ্ঞতাই ব্যক্তিগতভাবে অনুভব, দর্শন ও উপলব্ধি করেন - যেমন অনাহত নাদ শ্রবণ, সমাধি, দিব্য দর্শন (Vision in trance) ইত্যাদি।

কিন্তু এসব তাঁর অন্তরকে তৃপ্তির বদলে আরও অশান্ত করে তুলতে থাকে - মুক্তির হাতছানি সত্ত্বেও তা যেন অধরাই থেকে যায়।

এই সময় নানা ঘটনা পরম্পরায় আশ্চর্য্যজনক ভাবে তাঁর সাথে যোগাযোগ হয় ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ ইউজী কৃষ্ণমূর্তির। ইউজীর দর্শনে, স্পর্শনে, বাক্যবাণে আগুন লেগে যায় সব্যসাচীর অন্তরের গহনে সযত্নে লালিত-পালিত সংস্কারের মধ্যে। ভেঙ্গে যায় অহং-এর দুর্ভেদ্য বর্ম - কখনো হতাশ, কখনো হতবাক, কখনো চমকিত সব্যসাচীর মধ্যে মূলগত বৈপ্লবিক পরিবর্তন শুরু হয় এই সময়। ঊর্দ্ধচেতনার স্ফুরণ ঘটে তাঁর মধ্যে। এই চেতনার স্ফুরণ শুধু সূক্ষ্ম শরীরে বা প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না পরন্তু স্থুল পঞ্চভূত নির্মিত শরীরের মধ্যে স্ফুরিত হয়ে স্নায়ু - জীববিজ্ঞান ভিত্তিক রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে সাযুয্য বা ছন্দোময় অবস্থানের প্রয়োজনে তাঁর শরীরকে সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত করে দেয়।

সব্যসাচীর জীবনে রূপান্তরের এই প্রক্রিয়ার তীব্রতা ৪২ দিন স্থায়ী হয়েছিল। এই সময় তিনি মৃত্যু এবং নবজীবনের স্বাদ বারংবার অনুভবের মাধ্যমে অলৌকিকভাবে একাকী জগৎ সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিলেন। 'সতোরি' বা স্বল্পকালীন সমাধি-র মাধ্যমে এখনো উচ্চ চেতনার (অতিমানস চেতনা) বিভিন্ন স্তর তাঁর মধ্যে উন্মোচিত হলেও এবং তা তাঁর জীবন-কে প্রভাবিত করলেও স্বাভাবিক দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে আর ব্যহত করে না। মানবাত্মার মঙ্গল সাধনের জন্য উচ্চতর চেতনার এই প্রকাশ যা তাঁর শরীরকে অবলম্বন করে ও ক্রমাগত রূপান্তরিত করে বিশ্বের বুকে প্রকাশিত ও উন্মোচিত হয়ে চলেছে তা মাতৃ-প্রকৃতির এক কখনোই শেষ না হওয়া প্রক্রিয়া কারণ সমাজ-সংস্কৃতি-সংস্কার -এর জগতে শক্তির নব নব বিন্যাসে চেতনার এই ঊর্দ্ধায়ন মানবাত্মার মঙ্গলের জন্য অবশ্যম্ভাবী। যদিও সব্যসাচী চেতনার স্তরের অস্তিত্ব মানেন না। তাঁর মতে স্বপ্ন না ভাঙ্গলে যা যেরকম সেটি ঠিক সেইরকমভাবে দেখা অসম্ভব এবং তিনি সর্বদাই জ্ঞানালোকপ্রাপ্তি, নির্ব্বাণ, মোক্ষ, প্রেম, সমাজ সংস্কারের মহানতা প্রভৃতি বিষয়কে পুরোপুরি অস্বীকার করে থাকেন। তাঁর মতে আমাদের পশ্চাৎপট এবং সংস্কার আমাদের জীবনের সঙ্গে প্রকৃতির ছন্দময় অনুরণনের প্রতিবন্ধক। যদি ভাগ্যক্রমে অভিজ্ঞতার কাঠামো ভাঙ্গতে শুরু করে তখন অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়, কিন্তু এর কোনো তাৎপর্য নেই।

তাঁর জীবনের এই রূপান্তর প্রসঙ্গে সব্যসাচীর নিজের কথায় - ''আমি আমার অন্তর্নিহিত শক্তির পঁচানব্বই শতাংশ ব্যয় করেছি গভীর আকাঙ্খা, নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে জীবন জিজ্ঞাসার উত্তরের খোঁজে আর পাঁচ শতাংশ ব্যয় করেছি পদার্থবিদ্যার অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজে, এই হল আমার নিজের কাহিনী আর

বিশ্বপ্রকৃতির এ ব্যাপারে কি ভূমিকা বা কার্য সে রহস্যের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আমরা এখনো বিন্দু-বিসর্গও জানি না আর আমাদের বস্তুভিত্তিক সুখভোগের চাহিদার সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধও নেই। অর্থাৎ আত্মতৃপ্তি জনিত সুখভোগের এবং তথাকথিত ধার্মিক গুরু বা ভন্ড আধ্যাত্মবাদীদের আত্মশ্লাঘা ও ইন্দ্রিয় সুখভোগের বা বৈভবময় জীবন যাপনের চাতুরীর সঙ্গে এই পরিবর্তন সম্পূর্ণ সংগতি ও সম্পর্কহীন। তাই এই রূপান্তরকে সামাজিক লেনদেনের বাজারে উপভোগের সামগ্রী করে তোলা একেবারেই অসম্ভব।''

প্রান্তরেখার দিক্‌চক্রবালে উদীয়মান সূর্যের আলোর ছটা যেমন তমসাকে ভেদ করে জগতের বুকে আলোর বন্যা বইয়ে দেয়, জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত সব্যসাচীর জ্ঞান ও প্রেমের আলো তেমনি বর্তমান বিশ্বের সমাজব্যবস্থায় সংস্কৃতি-সংস্কারের চাপে হতাশ, উদ্‌ভ্রান্ত, দিশাহীন মানবাত্মার মধ্যে গ্রীষ্মের প্রচন্ড দাবদাহের পর বর্ষার বারিধারার ধরিত্রী-র বুকে বয়ে আনা শীতলতার স্পর্শের মতন উন্নত চেতনার মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর আঙ্গিকে ভারহীন মুক্তমানবের চিন্তাধারা যা মাতৃ-প্রকৃতির দিব্য আশীর্ব্বাদ স্বরূপ - সমস্ত জাগতিক কামনা বাসনা মুক্ত, শুদ্ধ-সাত্ত্বিক, স্বল্পাহারী, সদাহাস্যময়,অলৌকিক প্রাণশক্তিতে ভরপুর, বর্তমানে স্বেচ্ছাবসরপ্রাপ্ত সব্যসাচীর সংস্পর্শে আসা মানুষেরা যা তাঁর জ্ঞানের ও প্রেমের স্পর্শে সর্বদাই অনুভব করছেন।

রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।
রথযাত্রা / ৬ই আষাঢ় ১৪১৯।